## বিশেষ ক্রোড়পত্র

# গণমানুষের বিশ্ব বাণিজ্য

# বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই

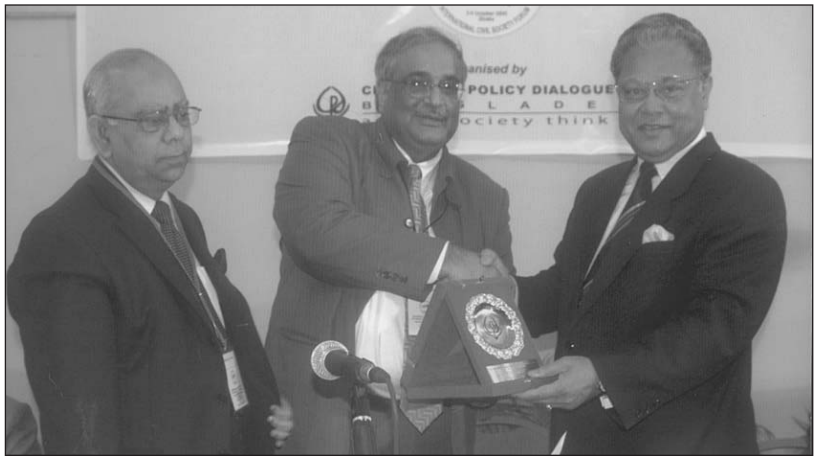


*জনগণের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পারবেন বাণিজ্যমন্ত্রী*

**আসজাদুল কিবরিয়া**

বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ১৯৯৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর অন্তত চার বছর লেগেছে বাংলাদেশ সরকারের। দরিদ্র দেশে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাসহ জানা-বোঝায় পিছিয়ে থাকা এর অন্যতম কারণ। জানা-বোঝায় পিছিয়ে থাকার জন্য অবশ্য সরকারের উন্নাসিক মনোভাব অনেকটাই দায়ী। দেশীয় পর্যায়ে বিশেষজ্ঞদের উৎসাহিত করা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করে তোলার কোনো উদ্যোগ ছিল না বহুদিন। তার মাশুল এখনও গুনতে হচ্ছে। তবে এখনও যে এই বিষয়ে সরকারি মনোভাবের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন হয়েছে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আর তা হতে পারেনি মূলত রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও সিদ্ধান্তহীনতা এবং অবশ্যই অবস্থানগত দ্বন্দ্বের কারণে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবেই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত। ফলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তোলা ও দক্ষ জনবলে প্রশিক্ষিত করার কোনো বিকল্প নেই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এখনও নিত্যদিনের বাজার দর ঠিক করা এবং দেশের বাণিজ্য সংগঠনগুলোর কাজে অধিক মাত্রায় সম্পৃক্ত করে রাখা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গুরত্বকে খাটো করে দেখার জন্য মন্ত্রণালয়ে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ দেখাই বোধহয় যথেষ্ট। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে মূল বাজেট ছিল ৫০ কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেটে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬৩ কোটি টাকা। আর ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ ১০৯ কোটি টাকা। অথচ একই সময়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ২৯৭ কোটি টাকা। সম্পদের সীমাবদ্ধতা একদিকে যেমন মন্ত্রণালয়ের কাজে কাঙ্ক্ষিত গতি আনতে পারছে না, অন্যদিকে ব্যাহত হচ্ছে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল গড়ে তোলা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি ডব্লিউটিও সেল গঠন করা হয়েছে। কিন্তু সেলে যে বিপুল পরিমাণ কাজ করা প্রয়োজন, তাতেও বাদ সাধছে জনবলের ঘাটতি ও বাজেট স্বল্পতা। এছাড়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় অধিক দক্ষ অনেক কর্মকর্তাকেই সেলের বাইরে রেখে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বহুদিন পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের ডাম্পিং গ্রাউন্ড ছিল। গত কয়েক বছরে অবশ্য অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অথচ এখন পর্যন্ত ট্যারিফ কমিশনের কার্যক্রম মুষ্টিমেয় দক্ষ কর্মকর্তার ওপর নির্ভরশীল। আর বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট এখন পর্যন্ত কোনো কাজ দেখাতে পারেনি বললেই চলে।

এ প্রসঙ্গে সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের মহাসচিব মাহফুজউল্লাহ বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে আসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বকে শক্তিশালী ও দক্ষ হতে হবে। তাহলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কেও যথেষ্ট শক্তিশালী ও কার্যকর করা যাবে। কারণ বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় আলোচনা-সমঝোতা কার্যক্রমে একাধারে কূটনীতি ও রাজনীতি প্রয়োগ করতে হয়। বাংলাদেশকেও এই দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, ইতিমধ্যেই এলডিসিগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে যে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমে অনেকটা এগিয়েছি যা বাংলাদেশসহ এলডিসিগুলোর জন্য বড় অর্জন। কারণ, উন্নত বিশ্বের সঙ্গে দর কষাকষি করতে যে ব্যাপক প্রস্তুতির প্রযোজন, সেই প্রস্তুতিতে বাংলাদেশ অনেকটাই ভূমিকা রাখতে পারছে। সর্বশেষ ঢাকায় এই অক্টোবরে যে সুশীল সমাজের সম্মেলন হয়ে গেল এটা তার একটি বড় প্রমাণ।

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলো কাজ করে চলেছে। কিন্তু সারা বিশ্ব যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা সেভাবে এগুতে পারছি না। এখানেই প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রজ্ঞার। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী যে ক্ষমতা ভোগ করেন, বাণিজ্যমন্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই তা পান না। তাই বলে অর্থমন্ত্রী ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের পছন্দমাফিক সবকিছু হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বাংলাদেশে আমদানি বাণিজ্যে শুল্ক হ্রাস-বৃদ্ধির অভিঘাত বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ট্যারিফ কমিশনের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যুক্তিযুক্ত প্রথা হলেও অর্থ মন্ত্রণালয়ই এসব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যখন বহুপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য আলোচনায় বসছে এবং এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশের জন্য সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছে, তখন অর্থ মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের চাপে যুক্তিবুদ্ধিহীনভাবে আমদানি শুল্ক হার কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে বিপরীতধর্মী অবস্থানে পড়ছে বাংলাদেশ।

১৯৯২-৯৩ অর্থবছরের বাংলাদেশে আমদানি শুল্কের মোট ১৫টি ধাপ ছিল যেখানে

**‘বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে আসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বকে শক্তিশালী ও দক্ষ হতে হবে। তাহলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কেও যথেষ্ট শক্তিশালী ও কার্যকর করা যাবে। কারণ বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় আলোচনা-সমঝোতা কার্যক্রমে একাধারে কূটনীতি ও রাজনীতি প্রয়োগ করতে হয়’**

সর্বোচ্চ শুল্ক ছিল ৩০০%। ১৩ বছর পর ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শুল্কহার ২৫% আর শুল্ক ধাপ চারটি (০%, ৭.৫%, ১৫% ও ২৫%)। এই যে সর্বোচ্চ শুল্ক হার ২০০৩-০৪ অর্থবছরের ৩২.৫% থেকে এক লাফে ২৫%-এ নামিয়ে আনা হলো আইএমএফের সঙ্গে সম্পাদিত পিআরএজিএফ চুক্তির আওতায় সাত পর্যায়ে ৪৯ কোটি ডলার সাহায্য পাওয়ার অন্যতম শর্ত পালন হিসেবে। আইএমএফ অবশ্য ২০০৩-০৪ অর্থবছরের জন্য সর্বোচ্চ শুল্কহার ৩০% এবং তার পরের বছর ২৫% করার কথা বলেছিল। অতি উৎসাহ সাইফুর এবারেই ২৫% করে স্থানীয় শিল্পের (বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি) কোমর ভেঙে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অন্যদিকে ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে গড়ে অভারিত ও বারিত শুল্কহার ছিল যথাক্রমে ৪৭.৪% ও ২৩.৬%। এক যুগ পেরিয়ে এসে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এটি হয়েছে যথাক্রমে ১৩.৫২% ও ৯.১%। আবার ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬৪৫.৪ কোটি ডলার যার মধ্যে উন্মুক্ততার হার ছিল ২০.১%। আর ২০০৩-০৪ অর্থবছরে তা হয়েছে ৩০%। এই সময়কালে যে হারে রপ্তানি বেড়েছে তার চেয়ে দ্রুত হারে বেড়েছে আমদানি। আমাদের দেশে যে আমদানি বেশি হবে তা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। বিশেষ করে শিল্প উৎপাদনের কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যসামগ্রীর জন্য আমদানির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি ভোগ্যপণ্য ও অনুৎপাদশীল সামগ্রী আমদানি যেভাবে বাড়ছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এতে অর্থনীতিতে চাপ বাড়ছে।

এখানে যে বিষয়টি পর্যবেক্ষণের তা হলো, শুল্ক কাঠামো পুনর্বিন্যাসে ট্যারিফ কমিশন বা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মতামত কতোটা আমলে নেয়া হয়েছে বা আদৌ নেয়া হয়েছে কি না। সাইফুর রহমানের কর্মকান্ড এবং বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ প্রীতি অবশ্য বলে দেয় যে, তিনি ওসবের ধার ধারেননি। তাই যদি হবে, তাহলে তিনিই যান না কেন ডব্লিউটিওতে?

১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার তৃতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। সিয়াটলে এলডিসির নেতৃত্ব দিতে পারার কৃতিত্ব তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এখনও উচ্চস্বরে গর্ব করে বলে বেড়ান। বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে আর কিছু না পারুন, এলডিসির নেতা হতে পারাটা তোফায়েল আহমদের একটা বিশাল অর্জন ছিল। ২০০১ সালে দোহায় অবশ্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর পক্ষে তেমন কিছু করা সম্ভব হয়নি। কারণ, সেবার তানজানিয়া মূল নেতৃত্বটা নিয়ে নিয়েছিল অনেক আগেই। তবে ২০০৩ সালে কানকুনে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু একাধারে বাংলাদেশের ও এলডিসসির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর এবার ২০০৫ সালে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাণিজ্যমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এটি তাঁর প্রথম যোগদান। তাঁর ওপর চাপ এবার অবশ্য কম এ কারণে যে, এলডিসির মুখপাত্র হিসেবে এবার জাম্বিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী দীপক প্যাটেল নেতৃত্ব দেবেন। তারপরও বাংলাদেশের অবস্থান গুরত্বপূর্ণ থাকছে।

## হংকং বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল

| | |
|---|---|
| **১. এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী**<br>বাণিজ্য মন্ত্রী | দলনেতা |
| **২. জনাব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী**<br>বাণিজ্য সচিব | বিকল্প দলনেতা |
| **৩. জনাব নাসিরউদ্দিন আহমেদ**<br>মহা-পরিচালক, ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| **৪. মিসেস শরিফা খান**<br>উপ-পরিচালক, ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| **৫. ড. তৌফিক আলী**<br>রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, জেনেভা | সদস্য |
| **৬. জনাব মোঃ মোতাহার হোসাইন**<br>ইকনমিক মিনিস্টার, বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, জেনেভা | সদস্য |
| **৭. জনাব মোঃ দানিয়ুল ইসলাম**<br>প্রথম সচিব | সদস্য এবং<br>ডেলিগেশন কো-অর্ডিনেটর |
| **৮. জনাব আশফাকুর রহমান**<br>রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ মিশন, বেইজিং, চীন | সদস্য |
| **৯. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম**<br>কমার্শিয়াল কাউন্সেলর, বাংলাদেশ মিশন, বেইজিং, চীন | সদস্য |
| **১০. সৈয়দ আতাউর রহমান**<br>অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| **১১. ড. মোস্তফা আবিদ খান**<br>উপ-প্রধান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন | সদস্য |
| **১২. জনাব আ, তা, মু সারওয়ার হোসেন**<br>সদস্য (শুল্ক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | সদস্য |
| **১৩. জনাব এএফ এম গওসুল আযম সরকার**<br>কনসাল জেনারেল অব বাংলাদেশ, কনসুলেট অফিস, হংকং | সদস্য |
| **১৪. মিসেস কাজী আনারকলি**<br>ভাইস-কনসাল জেনারেল অব বাংলাদেশ,<br>কনসুলেট অফিস, হংকং | সদস্য |
| **১৫. ড. মোস্তাফিজুর রহমান**<br>গবেষণা পরিচালক,<br>সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), ঢাকা | সদস্য |
| **১৬. প্রফেসর মোহাম্মদ আলী তসলিম**<br>নির্বাহী পরিচালক ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, ঢাকা | সদস্য |
| **১৭. সৈয়দ আলগমীর ফারুক চৌধুরী**<br>সিনিয়র অ্যাডভাইজার<br>বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট, ঢাকা | সদস্য |
| **১৮. জনাব মাহবুবুর রহমান**<br>সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-বাংলাদেশ | সদস্য |
| **১৯. জনাব মীর নাসির হোসেন**<br>সভাপতি, এফবিসিসিআই | সদস্য |
| **২০. জনাব আনিসুল হক**<br>সভাপতি, বিজিএমইএ | সদস্য |
| **২১. জনাব মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল**<br>চেয়ারম্যান, বিটিএমএ | সদস্য |
| **২২. জনাব কে এম এইচ শহীদুল হক**<br>পরিচালক, ডিসিসিআই | সদস্য |

# দোহা রাউন্ড আলোচনায় উন্নয়ন ভাবনার অর্থপূর্ণ প্রয়োগ চাই

## আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজের ফোরামে আহ্বান...

**সৈয়দ শহীদ, শারমীন রিনভী ও এম জামাল উদ্দিন**

একটি নিয়মতান্ত্রিক বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াসকে কার্যকর রূপ দিতে উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে চেষ্টা চলছে অনেক দিন ধরে। এই প্রয়াসের ধারাবাহিকতায় বিশ্বজুড়ে এখন বিভিন্ন কর্ম-তৎপরতা চলছে বিভিন্নভাবে। বিশেষ করে আগামী ১৩-১৮ ডিসেম্বর হংকংয়ে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যায়ের ৬ষ্ঠ সম্মেলনকে সামনে রেখে এখন এসব তৎপরতা তুঙ্গে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৩-৫ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়া আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজের ফোরাম ২০০৫ ছিল স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অনুকূলে অবস্থান নেওয়ার একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ। হংকং বৈঠকে এলডিসিগুলো কিভাবে নিজেদের স্বার্থ তুলে ধরবে, এবং তা তুলে ধরতে কি কি করা উচিত, সে সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয় এই ফোরামে। ফোরামে গৃহীত ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে হংকং সম্মেলনে এলডিসিগুলোর অভিন্ন স্বার্থ রক্ষায় সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। ঘোষণায় উন্নত দেশের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের পণ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানানোসহ বিশ্ব বাণিজ্যে এলডিসির ন্যায্য অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। ১৮ দফা সংবলিত ঢাকা ঘোষণায় বাণিজ্য অবরোধমূলক পদক্ষেপ অব্যাহতি, কৃষক ও আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ, ভারসাম্যপূর্ণ মেধাস্বত্ব আইন বাস্তবায়ন, কৃষিপণ্যের বাজারভিত্তিক মূল্য নিশ্চিতকরণ, সেবাখাতে মোড ৪-এর আওতায় এলডিসি থেকে দক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমিক এবং সেবা প্রদানকারীদের উন্নত বিশ্বের বাজারে সাময়িকভিত্তিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য দাবি গৃহীত হয়েছে। এইসব দাবি নিয়ে এলডিসিগুলো যেন হংকং বৈঠকে দরকষাকষি করে সেই আহ্বানও জানানো হয়। তিনদিনের ফোরামের আলোচনায় সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে দোহা রাউন্ডের সব আলোচনায় উন্নয়ন ভাবনাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে বলা হয় যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

*বক্তব্য রাখছেন মৌসুমী মহাপাত্র*

**একটি সফল আয়োজন**

২০০৩ সালে কানকুন সম্মেলনকে সামনে রেখে সিপিডি ঢাকায় প্রথম একটি নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজের সম্মেলন আয়োজন করে যা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সিপিডি এ বছর দ্বিতীয় বারের মতো এই ফোরামের আয়োজন করল যেখানে সিপিডিরসহ আয়োজক ছিল আটটি আন্তর্জাতিক এনজিও। এগুলো হলো : এ্যাকশন এইড ইন্টারন্যাশনাল; কনজ্যুমারস ইন্টারন্যাশনাল; এন্ডা টিয়ারস মন্ডে; ইইউ-এলডিসি নেটওয়ার্ক; অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল; সাউথ এশিয়া ওয়াচ অন ট্রেড, ইকনোমিক্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট (সাউতি); ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ট্রেড এন্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট; এবং সাউদার্ন এন্ড ইস্টার্ন আফ্রিকান ট্রেড ইনফরমেশন এন্ড নেগোসিয়েশানস ইনস্টিটিউট। এছাড়া এ ফোরামের আয়োজনে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, চেম্বার, বাণিজ্য বিষয়ক গবেষণা ও এডভোকেসি সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং নারী অধিকার ও পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ২৬টি সংগঠন যাদের নিয়ে গঠিত হয় জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ।

তিনদিনের এই সম্মেলনে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক প্যাসকেল ল্যামির প্রতিনিধি অ্যানে ব্লাঙ্ক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় এলডিসিসির নেতৃত্বদানকারী জাম্বিয়ার রাষ্ট্রদূত লাভ মেতেসা, ইউএনডিপির প্রতিনিধি, ডব্লিউটিও-র প্রতিনিধিসহ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার ২৬টি দেশের ৪৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিন ৩ অক্টোবর বিকেলে শেরাটন হোটেলে ফোরামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:)

আলতাফ হোসেন চৌধুরী। সূচনা বক্তব্য রাখেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান। বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও নীতি নির্ধারকবৃন্দ, সুশীল সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দ, গবেষকবৃন্দ, বিভিন্ন চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের প্রতিনিধিত্বকারী তিন শতাধিক বাংলাদেশী প্রতিনিধি এ ফোরামে অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

*বক্তব্য রাখছেন সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী*

*বক্তব্য রাখছেন সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের মাহফুজ উল্লাহ*

রিয়াজ রহমান ও বাণিজ্য সচিব ফারুক আমেদ সিদ্দিকী। বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ও বাণিজ্য সচিব উভয়ই ফোরামের সুপারিশসমূহ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার কথা বলেছেন।

ঢাকায় নাগরিক সমাজের এবারের ফোরামের মাধ্যমে কার্যত এলডিসিগুলোর অবস্থান সমুন্নত হওয়ার একটি বার্তা উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের ভেতর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার কর্মকান্ড নিয়ে সচেতনতা অনেক বেড়েছে। এসব কারণেই সিপিডির পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সুশীল সমাজের এই ফোরাম যেন প্রতি বছর অন্তর নিয়মিত আয়োজন করা হয়। কারণ, এলডিসিগুলোর সরকারকে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য আলোচনায় সহায়তা যোগাতে এবং দৃঢ় অবস্থান নিতে এ ধরনের ফোরামের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সিপিডি অবশ্য প্রস্তাব করেছে যে যদি অন কোনো দেশ এটি করতে অপারগতা প্রকাশ করে তাহলে এটি আবার ঢাকাতেই হবে। তবে অন্য কোনোখানে হলে সিপিডি সবরকম সহায়তা দেবে।

**প্রাণবন্ত কার্য অধিবেশন**

দুটি প্লিনারী ও আটটি কার্য অধিবেশনগুলোয় প্রাণবন্ত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে এলডিসির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় এমনবাবে উঠে আসে যা সবাইকে নতুনভাবে চিন্তার অবকাশ তৈরি করে দেয়। সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা একদিকে এলডিসিগুলোকে বলছে আমদানি শুল্ক না কমানোর জন্য, অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ বলছে শুল্ক বাড়ানোর জন্য। আবার আইএমএফ একবার বলে ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানোর জন্য, আবার বলে বাড়ানোর জন্য। এভাবে একই বিষয়ে তিন সংগঠনের বিভিন্নমুখী চাপের মুখে এলডিসিগুলো বিপাকে পড়ছে। তিনি এসব বিষয়ে এই তিন সংস্থার কর্মপরিকল্পনার সমন্বয় করার ওপর জোর দেন। খসরুর বক্তব্যটির তাৎপর্য বুঝতে বাংলাদেশের শুল্কহার হ্রাসের প্রবণতা পর্যালোচনা করাই যথেষ্ট। বস্তুত '৯০-র দশক থেকে যেভাবে বাণিজ্য বাধা অপসারণের নামে আইএমএফ-এর পরামর্শে শুল্কহার দ্রুতগতিতে কমিয়ে আনা হয়েছে তার মূল্য দিতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে গড়ে আমদানি শুল্কহার ছিল ৪৭.৪% যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ১৩.৫২%-এ। তার মানে একযুগে বাংলাদেশ আমদানি শুল্কহার প্রায় তিনগুণ কমিয়ে ফেলেছে। যদি ভারিত গড় (আমদানি পণ্যের গুরুত্ব অনুসারে কর বিন্যাস) হিসেবে নেয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে গড় হার ৯.১%-এ নেমে এসেছে, যার মানে হলো এক অঙ্কের কোটায় শুল্কহার রয়েছে। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ শুল্কহার ছিল ৩০০% যা কিনা এখন ২৫%। আবার ঐসময়কালে শুল্কধাপ ছিল ১৫ যা এখন কার্যত তিন। জনাব খসরু সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়ে যাওয়া এলডিসিগুলোকে যে ঝুঁকির মুখে পড়েছে, ডব্লিউটিওতে বিষয়টি গুরুত্বেও সঙ্গে নেয়ার আহ্বান জানান।

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, ডব্লিউটিও শুধু একটি আশার

*বক্তব্য রাখছেন এমসিসিআই সভাপতি কুতুব উদ্দিন আহমেদ*

প্রতীক হয়ে গেছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো অতীতে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা রাখেনি। কিন্তু এর ক্ষতিপূরণও দেয়নি। এতে বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য আলোচনায় নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তোফায়েল আহমেদ বলেন, বিশ্ববাণিজ্য সংস্টার আলোচনায় উন্নত দেশই প্রাধান্য বিস্তার করে। এলডিসিগুলোর কণ্ঠস্বর উঠে আসে খুবই মৃদুভাবে। তাই এলডিসিগুলোর দেশের দাবি তুলে আনতে সুশীল সমাজের ভূমিকা আরো জোরদার করতে হবে।

জেনেভায় বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ড. তৌফিক আলী বলেছেন, এলডিসিগুলোর শিল্পখাত রক্ষায় সমন্বিত নীতি গ্রহণ করতে

*অংশগ্রহণকারীদের একাংশ*

*একটি কার্যঅধিবেশনের মূল বক্তারা*

হবে। প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়াতে সরবরাহের দিকের উন্নতি ঘটাতে হবে। এজন্য হংকংয়ে এলডিসিগুলোর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা তৈরি করতে হবে। সাউতির প্রদীপ মেহতা বলেছেন, ভারত ও চীনের মতো বড় উন্নয়নশীল দেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে। তিনি এন্টি ডাম্পিং পদক্ষেপে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে মন্তব্য করেন।

এভাবে আরো যারা আলোচনায় অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে ছিলেন সাবেক বাণিজ্য সচিব সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী, সিপিডির গবেষণা পরিচালক প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, ড. ফাহমিদা খাতুন, ড. উত্তম কুমার দেব, ড. গোলাম মোয়াজ্জেম, সৈয়দ সাঈফউদ্দিন হোসেন, কাজী মাহমুদুর রহমান, নিজেরা করির খুশী কবির, অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের নাসরিন হক, মৌসুমী মহাপাত্র ও আমানুর রহমান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ড. মোস্তফা আবিদ খান, সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের মাহফুজউল্লাহ; বিজিএমইএ সভাপতি আনিসুল হক, এমসিসিআই সভাপতি কুতুবউদ্দিন আহমেদ, এফবিসিসিআই সভাপতি মীর নাসির হোসেন, ঢাকা চেম্বারের মনজুর আহমেদ, ব্র্যাকের আবদুল মুঈদ চৌধুরী, কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ডি-নেটের ড. অনন্য রায়হান, ইনসিডিনের একেএম মাকসুদ আলী, কর্মজীবী নারীর জিয়াউল হক মুক্তা, কনজ্যুমার ইন্টারন্যাশনালের এমা হ্যারিসন, অক্সফামের ড. সমর ভর্মা, সেন্টাডের প্রভাষ রঞ্জন, সাউতির নবীন ধল, অ্যাকশন এইড গাম্বিয়ার বুবা খান প্রমুখ। তারা বিভিন্ন বিষয়ে এলডিসির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন।

### 'অগ্রসর' উন্নয়নশীল দেশ বিতর্ক

ঢাকায় এই ফোরামে যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে উচ্চকিত আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে সেটি হলো অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশের বাজারে এলডিসির প্রবেশাধিকার। ফোরামের বিভিন্ন পর্বে বার বার বলা হয়েছে, চীন ও ভারতের মতো অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজারে এলডিসিগুলোর পণ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার দেয়া হোক। ঢাকা ঘোষণার খসড়াতেও অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজারে প্রবেশাধিকারের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও চূড়ান্ত ঘোষণায় তা কিছু অবস্থানগত ও কৌশলগত কারণে বাদ দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে সমাপনী পর্বে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে এলডিসির দাবির মূল সুরটি জোরালোভাবেই ঘোষণায় উঠে এসেছে। সেকারণে কোনো শব্দ বা অভিধা বাদ পড়ল কি থাকল তা অতোটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তিনি আরো বলেন যে অগ্রসর উন্নয়শীল দেশ কোনগুলো সেটি নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। যেহেতু এখন পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত এমন কোনো সূচক বা মাপকাঠি তৈরি হয়নি যার মাধ্যমে বলা যাবে উন্নয়নশীল কোন দেশগুলো অগ্রসর, সেহেতু এসব পরিচিতি ব্যবহার না করাই উত্তম। বিশেষত যদি তা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

তবে এলডিসিগুলোর এই দাবিটি কিন্তু একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত এটি উন্নত বিশ্বের সঙ্গে দরকষাকষির ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল ও এলডিসিগুলোকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে এনে দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দিয়ে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দাবি জানাতে পারে যে ভারতীয় পণ্যকে এবার যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশাধিকার দিতে হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশও অনুরূপ দাবি তুলতে পারে এই যুক্তিতে যে ভারতের মতো দেশ যদি প্রবেশাধিকার দেয়, তাহলে আমেরিকা কেন দেবে না? দ্বিতীয়ত, বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় এটি উন্নয়নশীল ও এলডিসিগুলোর মধ্যে সংহতি আরো জোরদার করবে। এলডিসিগুলো এই সুবিধার বিনিময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষি বিষয়ক দাবি বিশেষত উন্নত দেশ কর্তৃক উচ্চহারে যে ভর্তুকি দেয়, তা কমিয়ে আনাতে সমর্থন দিতে পারে। তৃতীয়ত, অকৃষিজাত পণ্যের বাজার সুবিধা (নামা) সমঝোতা আলোচনায় উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর পণ্য আমদানির ওপর উচ্চহারে আরোপিত শুল্কহার কমানোর যে দাবি রয়েছে, তাতে এলডিসিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, এলডিসিগুলো উন্নত বিশ্বের বাজারে পণ্য

রপ্তানির যে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে, তা কমে যাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার সে ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে দেবে।

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'নানা আলোচনায় এলডিসিগুলোর জন্য যে প্রেফারেন্স ইরোসন হতে যাচ্ছে, তা যেহেতু বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য সমঝোতা আলোচনার আওতাতেই হচ্ছে, সেহেতু এলডিসিগুলোর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এই সংস্থার আওতাতেই করতে হবে।' তিনি আরো বলেন, 'অনেক উন্নত দেশের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রবেশাধিকার দেয়া হলেও রুলস অব অরিজিনের জটিলতায় এলডিসিগুলো তেমন সুবিধা করতে পারেনি। এচাড়া এলডিসিগুলোর নিজস্ব সরবরাহজনিত ঘাটতি থাকায় তারাও সুবিধা পেতে পারেনি।'

অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশ কাদের বলা হবে তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট মানদন্ড না থাকলেও বিশ্ব অর্থনীতিতে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্ববাণিজ্যেও পাশাপাশি বৈশ্বিক রাজনীতিতে গতি-নির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ও উঠছে এমন উন্নয়নশীল দেশগুলোকেই এই কাতারে ফেলা যায়। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুর (যারা একত্রে ব্রিকস বলে পরিচিতি)-এই দেশগুলোর অর্থনীতির আয়তন বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে যে বিশাল বাজার তৈরি হয়েছে তাতে এলডিসিগুলোকে বেশ খানিকটা বাজার সুবিধা দেয়ার ক্ষমতাও তৈরি হয়েছে।

ছবি : **সিপিডি**

# ঢা কা ঘো ষ ণা

সুশীল সমাজের এ আন্তর্জাতিক ফোরামে দোহা রাউন্ডের অধীনে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চলমান আলোচনায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের স্বার্থ সুরক্ষার নিমিত্তে বিভিন্ন দাবি ও কৌশলসমূহ আলোচিত হয়। ফোরামে হংকংয়ে অনুষ্ঠিতব্য মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের কর্মসূচির ব্যাপক পর্যালোচনা, এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রস্তাবনার বিশ্লেষণ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের স্বার্থের আলোকে বিভিন্ন দাবি ও সুপারিশ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সুশীল সমাজের এ সকল প্রস্তাব এবং দাবির ভিত্তিতে এ ফোরামের অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দ 'আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজের ঢাকা ঘোষণা' গ্রহণ করেন।

**ঢাকা ঘোষণার মূল ও অধিকারপ্রাপ্ত দাবিসমূহ হচ্ছে ঃ**

১. উন্নত দেশের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সকল রপ্তানি পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা (স্বল্পোন্নত দেশের সক্ষমতা মাফিক রুলস অব অরিজিন সাপেক্ষে) নিশ্চিত করতে হবে এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আওতায় এ বিষয়ে উন্নত দেশসমূহকে বাধ্যতামূলক অঙ্গীকার করতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যাদের পক্ষে সম্ভব, তাদেরও স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের সকল রপ্তানি পণ্যের শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা দিতে হবে এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

২. স্বল্পোন্নত দেশের সকল রপ্তানিজাত পণ্যকে সব ধরনের বাণিজ্য অবরোধমূলক পদক্ষেপ (Trade Remedy Measures) যেমন- এন্টি ডাম্পিং ও কাউন্টার ভেইলিং ডিউটি থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

৩. চলমান বাণিজ্য আলোচনার প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য শুল্কহ্রাস জনিত কারণে বাজার সুবিধার ক্রমহ্রাসমানতার প্রেক্ষাপটে ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. অভ্যন্তরীণ কৃষিখাতের সংরক্ষণ এবং খাদ্য এবং কৃষকদের জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কৃষি নীতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতির প্রয়োগে নমনীয়তা প্রদর্শন করতে হবে।

৫. কৃষি বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সকল ধরনের ভর্তুকির অবসান করে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে কৃষিপণ্যের বাজার ভিত্তিক মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নিট খাদ্য আমাদানিকারক স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ বিবেচনা করতে হবে, এবং তাদের সম্ভাব্য অসুবিধাসমূহ নিরসনে প্রয়োজনীয় সাহায্য নিশ্চিত করতে হবে। দুঃস্থ জনগোষ্ঠী এবং মানবিক কারণে প্রদত্ত খাদ্য সাহায্য অব্যাহত রাখতে হবে।

৬. তুলা উৎপাদনকারী দরিদ্র কৃষকদের জীবিকার অধিকার এবং ন্যায্য বাণিজ্য নিশ্চিত করতে উন্নত দেশসমূহে তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান বন্ধ করতে হবে।

৭. অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিত করতে মেধাস্বত্ত আইন (ট্রিপস) যেন কোনোভাবেই বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

৮. কৃষক, আদিবাসী জনগণ ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ এবং প্যাটেন্ট ও অন্যান্য সকল মেধাস্বত্বের ক্ষেত্রে 'ভারসাম্যপূর্ণভাবে সুবিধা বন্টন' (বেনিফিট শেয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট) নিশ্চিত করতে হবে।

৯. সেবা চুক্তির মোড ৪-এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশ থেকে দক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রমিক এবং সেবাদানকারীদের উন্নত দেশের শ্রম ও সেবাবাজারে সাময়িকভিত্তিতে প্রবেশের অধিকার অবাধ ও নিশ্চিত করতে হবে।

১০. স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং শিল্পখাতে বৈচিত্র্য আনয়নের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভর্তুকির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাবে না।

১১. স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উপর নতুন কোনো বাণিজ্য শৃংখলা প্রয়োগের পূর্বে উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল প্রস্তাবের কার্যকর (Implementation Related Issues) মীমাংসা করতে হবে।

১২. উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিশেষ এবং পৃথক ব্যবস্থা (S&DT) বিষয়ে কাঠামোগত চুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়নের পর্যায়কে বিবেচনায় নিতে হবে, এবং বিশেষ ও পৃথক ব্যবস্থার অধীনে প্রদত্ত সকল অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক হতে হবে।

১৩. বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক শর্তাবলীর অবসান করতে হবে।

১৪. হংকং মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক এবং তার প্রস্তুতিমূলক আলোচনায় স্বচ্ছতা আনয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের কার্যকর অংশ গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রয়োজনীয় সরবরাহ সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা সৃষ্টি করতে যথাপরিমাণ ও কার্যকর প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে।

১৬. বাণিজ্য আলোচনার ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত সকল সুবিধার ন্যায্য বন্টন নিশ্চিত করার জন্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সরকারকে সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

১৭. বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ঐক্য বজায় রাখতে হবে।

১৮. বাণিজ্য আলোচনায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সরকার স্ব স্ব দেশের জনগণের কল্যাণকে নিশ্চিত করতে কোনো ধরনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না।

# ‘ডব্লিউটিও-র গতি-প্রকৃতি সঠিক দিকে যাচ্ছে না’

তোফায়েল আহমেদ
*সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী*

***সাপ্তাহিক ২০০০ : ১৯৯৯ সালে সিয়াটোল, ২০০১ সালে দোহা এবং ২০০৩ সালে কানকুনের পর বিশ্ব বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি কোন দিকে যাচ্ছে বলে মনে করেন?***

**তোফায়েল আহমেদ :** ১৯৯৫ সালের ১ ডিসেম্বর মরক্কোর মারাকাশের উরুগুয়েন্ট এগ্রিমেন্ট হয়। এই এগ্রিমেন্টের পর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কাজ শুরু করে। এই উরুগুয়েন্ট এগ্রিমেন্টে উন্নত দেশগুলোর একটি কমিটমেন্ট ছিল। বিশ্বায়ন এবং বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে যদি বোঝা যায় যে, দরিদ্র দেশগুলো আরো দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এই দরিদ্র দেশগুলোর জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এরপর কার্যক্রম শুরু হলো। ’৯৬ সালের ৮ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে মন্ত্রিপরিষদের দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। সে বৈঠকে বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি নেতৃত্ব দিই। ঐ বৈঠকে স্বল্পোন্নত ৮টি দেশের মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করি। ’৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার ছয় মাসের মধ্যে আমরা একটি পরিকল্পনা করি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই আলোচনা করে কর্মপদ্ধতি বের করি। বৈঠকে ঘোষণাপত্র তৈরি করার সময় আমার বক্তব্যের চরম বিরোধিতা করা হয়েছিল। আমার বক্তব্য ছিল শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা দিতে হবে। এ বিষয়টি সম্পর্কে আমেরিকা, জাপান আপত্তি করেছিল। আমি বলেছিলাম, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সমস্যা যদি চিহ্নিত করা না হয় তাহলে এই ডিক্লারেশনে আমরা সই করব না। তখন বাধ্য হয়ে আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ২২ দফা ঘোষণাপত্রের সিদ্ধান্ত হয়। এ সিঙ্গাপুরের মন্ত্রিপরিষদের সভা ছিল সফল। আমাদের সমস্যা আমরা তুলে ধরেছিলাম, প্রমাণ করেছিলাম। দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার মিটিং ছিল জেনেভায় ’৯৮ সালে। ঐ বৈঠকে বিশ্বের বড় বড় নেতারা এসেছিলেন। ঐ সভায় বিল ক্লিনটন, টনি ব্লেয়ার, নেলসন ম্যান্ডেলা, ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রমুখ গ্যাটের ৫০ বছর পূর্তির ওপর কথা বলেন। পাশাপাশি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহযোগিতা করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তৃতীয় মন্ত্রিসভার কনফারেন্স ছিল সিয়াটলে। ওই মিটিংয়ে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষি নিয়ে উন্নত দেশগুলো কথা বলে। এর পরের সম্মেলন হয় দোহায়, তখন আর আমরা ক্ষমতায় নেই। এই সম্মেলনে কতগুলো সিদ্ধান্ত হয় যা কানকুনে পঞ্চম সম্মেলনে গিয়ে পিছিয়ে পড়ে। এখন ষষ্ঠ সম্মেলন হবে হংকংয়ে। আসলে বিশ্বায়ন এবং বাণিজ্য উদারীকরণের পুরা সুফল পেয়েছে উন্নত দেশগুলো। এর সুফল পাওয়ার কথা ছিল স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর। বাস্তবে তা হয়নি। বর্তমানে প্রধান সমস্যা কৃষিতে। সেটা হলো কৃষিতে ভর্তুকি থাকবে কি থাকবে না। আর বাংলাদেশও আগে এলডিসিতে এককভাবে নেতৃত্ব দিত সে অবস্থা এখন আর নেই। কারণ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যেও স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। যেমন আফ্রিকার কতগুলো দেশ তুলা উৎপাদন করছে। তারা তুলা রপ্তানি করে। কিন্তু উন্নত দেশ তুলা রপ্তানিতে যে পরিমাণ ভর্তুকি দেয় তাতে আফ্রিকার দেশগুলোর তুলা রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়। সে জন্য আফ্রিকান দেশগুলো চাচ্ছে যাতে ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হয়। এদিকে উন্নত দেশগুলো যদি তাদের ভর্তুকি প্রত্যাহার করে তা হলে আমাদের গার্মেন্টসের সুতার দাম বেড়ে যাবে। আমরা খাদ্য আমদানি করি। সুতরাং এলডিসি’র মধ্যে কেউ চায় সাবসিডি থাকুক আবার কেউ চায় বন্ধ হয়ে যাক। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা যেভাবে শুরু হয়েছিল সেই অবস্থা এখন আর নেই। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার গতি-প্রকৃতি সঠিক পথে যাচ্ছে না। যারা সুবিধা পাওয়ার কথা তারা নিয়ে নিয়েছে। যখন দেবার পালা তখন দিচ্ছে না। যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাও পালন করছে না।

***২০০০ : চলমান কৃষি বাণিজ্য আলোচনায় বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো কী কী?***

**তোফায়েল :** প্রসঙ্গটি আমি আগেই বলেছি। যেমন সিয়াটোল মিটিংয়ে আমরা বলেছি, আমরা সাবসিডি প্রত্যাহার করতে পারব না। আমরা দেশে বিভিন্ন সেক্টরে সাবসিডি দিই। যেমন সার উৎপাদন করতে যে টাকা খরচ হয় সেই মূল্যে বিক্রি করলে কৃষক কিনতে চাইবে না, পারবেও না। কাজেই স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিতে হবে, কোন কোন ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রত্যাহার করতে হবে, তার একটা সমন্বয় করতে হবে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় শুরুটা হয়েছিল ইতিবাচকভাবে। কিন্তু উন্নত দেশগুলো এর সুফল ভোগ করে আমাদের জন্য নেতিবাচক করে ফেলেছে।

***২০০০ : উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজারে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পণ্য প্রবেশাধিকার কিভাবে কার্যকর হতে পারে?***

**তোফায়েল :** আমাদের দাবি ছিল শুল্কমুক্ত, কোটামুক্ত বাজার সুবিধা। এটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কার্যকর করেছিল, যা বন্ধ হয়েছে। এটি আবার কার্যকর করতে হবে। শুধু তাই নয়, আমাদের আরেকটা সিদ্ধান্ত ছিল মানবসম্পদ রপ্তানি। এখানে যে কঠিন বাধ্যবাধকতা আছে তা শিথিল করা। অর্থাৎ কর্মজীবী মানুষ যাতে আমরা বিদেশে রপ্তানি করতে পারি তার একটা প্রস্তাব এখনো ঝুলে আছে।

***২০০০ : এ ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার কতটুকু আন্তরিক বলে মনে করেন?***

**তোফায়েল :** এ ব্যাপারে সরকারের কোনো আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয়নি। এর মূল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। সরকার তাদের সঙ্গে কোনো বিষয় আলোচনা করে না। এখানে কারো সঙ্গে কারো সমন্বয় নেই। বর্তমান সরকারের আমলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কোনো আলোচনা নেই, সমন্বয় নেই। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ট্রেড বডির কোনো সম্পর্ক নেই। সবগুলো দলীয়করণ করে একটি হচপচ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

***২০০০ : এ ধরনের অভিযোগ আপনাদের সরকারের বিরুদ্ধেও ছিল?***

**তোফায়েল :** আমাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কোনো অভিযোগ ছিল না। আমি যতগুলো বাণিজ্য সম্মেলনে গিয়েছি, সবগুলোতে দেশের বাণিজ্য প্রতিনিধি গিয়েছে। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা দেখেছে দেশী-বিদেশী মিডিয়া কীভাবে বাংলাদেশের কাভারেজ দিচ্ছে। আমি এবং ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সম্মিলিত প্রয়াসে ডিউটি ফ্রি, কোটা ফ্রি মার্কেট পাওয়া সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার এ ধরনের কোনো নজির স্থাপন করতে পারেনি।

সাক্ষাৎকার : **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

# ট্রিপস্ ও স্বল্পোন্নত দেশের চ্যালেঞ্জ

**এম জামাল উদ্দীন**

সৃজনশীল কিংবা উদ্ভাবনী কাজের স্বীকৃতি উদ্ভাবকের থাকা চাই। স্বত্ব সংরক্ষণের মাধ্যমে সেই অধিকার নিশ্চিত করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই মেধাভিত্তিক স্বত্ব সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্বে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ও মুক্তবাণিজ্যের সুবাদে স্বত্ব সংরক্ষণের বিষয়টি এখন প্রকটভাবে আলোচিত হচ্ছে। কথা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মেধা সম্পদ সংরক্ষণ আইন পালনের। উন্নত দেশগুলোও এই আইন যথাযথ পতিপালনের পক্ষে। কারণ, তারা মেধাসম্পদের বেশির ভাগের মালিক। গবেষণা ও উন্নয়নে প্রচুর ব্যয়, মেধা আকর্ষণে নানা বিভিন্ন কৌশল, অবকাঠামো ও সামাজিক সুবিধা এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে উন্নত বিশ্ব এই অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

### ট্রিপস: ইতিহাসেরই অংশ

মেধাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি হাল আমলের বা বিংশ শতকের প্রচলন বলে বেশিরভাগেরই ধারণা। কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাস বলে ভিন্ন কথা। ১৭০৯ সালে ব্রিটেনে রানী অ্যানের প্রতিকৃতি ভাস্কর্য 'দ্য স্ট্যাচু অব কুইন অ্যান'-কে বিশ্বের প্রথম কপিরাইটপ্রাপ্ত ভাস্কর্য বলে স্বীকার করা হয়। বলা হয়, সেই থেকে শিল্পকর্ম বা সৃজনকলায় কপি রাইটের বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। তবে এরও আগে ১৫দশ শতকে ইটালির ভেনিসে একটি আইন ছিল যার মাধ্যমে কোনো নতুন কিছুর উদ্ভাবক তার উদ্ভাবনীর জন্য একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করতেন। ১৬দশ শতকে এই ধরনের প্রবণতা জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস ও ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে।

সাড়ে তিন হাজার বছর আগে প্রাচীন কুমাররা তাদের কাদামাটির তৈরি আগুনে পোড়ান মাটির পাত্রে বিভিন্ন রকম চিহ্ন রাখত নিজেদের জিনিস চেনার জন্য বা অন্যের জিনিস থেকে আলাদা করার জন্য। সেগুলোই ছিল বিশ্বের প্রথম ট্রেড মার্ক, যা আজ থেকে মাত্র ৩৫০ বছর আগে ব্রিটেনে স্বীকৃতি পায় এবং ধীরে ধীরে আধুনিক জগতের দিকে প্রসার লাভ করে। ট্রেড মার্ক বা পেটেন্টের বিষয়গুলো নিয়ে অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (যাকে অর্থনীতির জনকও বলা হয়) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ওয়েলথ অব নেশনস'-এ ১৭৭৬ সালেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ।

### ট্রিপসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

স্বত্বাধিকার ও সংশ্লিষ্ট অধিকার;
ট্রেড মার্ক;
ভৌগোলিক নির্দেশনা;
শিল্প সংক্রান্ত নকশা;
পেটেন্ট;
সমন্বিত সার্কিটের নকশা;
অপ্রকাশিত বা গোপন বাণিজ্য তথ্য।
ট্রিপস চুক্তির মোট ৭৩টি ধারা।

### ডব্লিউটিও-তে ট্রিপস

বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব আইন বা ট্রিপস (ট্রেড রিলেটেড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস) প্রবর্তিত হয় ১৯৯৫ সালের মে মাসে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ১৪৮টি সদস্য রাষ্ট্র এই চুক্তি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। যদিও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে চুক্তি বাস্তবায়নে কিছু ছাড় দেয়া হয়েছে। উন্নত দেশগুলো চুক্তির এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৯৬ সাল থেকেই এর বাস্তবায়ন শুরু করেছে। উন্নয়নশীল বিশ্বকে মেধাসম্পদ সংরক্ষণ আইন পুরোপুরি বাস্তবায়নে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময় দেয়া হয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলো ২০০৬ সাল পর্যন্ত সময় পায়। শুধুমাত্র ২০১৬ সাল পর্যন্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত স্বত্ত্ব সংরক্ষণের জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলো সুযোগ পেয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) প্রতিষ্ঠার আগে জেনেভাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (ওয়াইপো) মেধাসম্পদ সংরক্ষণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতো। ১৯৯৫ সালে ডব্লিউটিও প্রতিষ্ঠার পর ওয়াইপো এবং ডব্লিউটিও যৌথভাবে মেধাসম্পদ সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ তদারকি করছে।

ট্রিপস চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে তাগিদ থাকলেও স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে এই চুক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে বিপদে ফেলতে পারে। চুক্তির বিভিন্ন ধারা নিয়ে রয়েছে নানা সমালোচনাও। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট চিন্তা করলেও চুক্তির অনেকগুলো ধারা সহায়ক নয়।

যদিও একথা ঠিক যে, ট্রিপস চুক্তি স্বত্ব সংরক্ষণের পাশাপাশি নতুন নতুন উদ্ভাবনে মনোযোগী করবে এবং উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হবেন নিত্যনতুন পণ্যের ডিজাইন থেকে শুরু করে চিত্তাকর্ষক পদক্ষেপ গ্রহণের। এছাড়া, বিশ্ব মানবতার উন্নয়নেও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। বিশ্বে জনসংখ্যার ব্যাপকতা, উষ্ণতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নতুন নতুন কৌশল ও প্রক্রিয়া তথা সম্পদ উদ্ভাবনের কোন বিকল্প নেই। মেধাসত্ব সংরক্ষণকে উন্নয়নের সহযোগী হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে নতুন সৃষ্টি এবং সব দেশেই এর মান বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া সমীচীন । উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উচিত এ খাতে গবেষণা ও উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ প্রদান এবং উদ্ভাবন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

### ট্রিপস যখন হুমকি

ঐতিহাসিকভাবে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ একটি প্রক্রিয়া হয়ে এলেও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিভিন্ন বৈষম্যমূলক নিয়ম-কানুন চাপিয়ে দিয়ে ট্রিপসকে গরীব দেশগুলোর জন্য একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা

হচ্ছে। মূলত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিজ বাণিজ্য ও ওষুধ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নত দেশগুলোর বাণিজ্যিক স্বার্থের অনুকূলে এই ট্রিপসের খসড়া প্রণয়ন করা হয় যেখানে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার, লোকজ জ্ঞানের উপর সামাজিক মালিকানা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সারা বিশ্বের মানুষের সাধারণ অধিকারকে অস্বীকার করে ধনী দেশের বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো অবাধ লুটপাটের অধিকারকে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল এই চুক্তির কু-প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনসিডিন বাংলাদেশ এই চুক্তির কয়েকটি নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করেছে।

ইনসিডিন মনে করছে, বাংলাদেশের কৃষিতে এই চুক্তির মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দুইটি প্রধান দিক থেকে। প্রথমত, এই চুক্তি কার্যকর হলে উন্নত দেশের কৃষি বাণিজ্য কর্পোরেশনগুলো আমাদের দেশের কৃষিতে হাইব্রিড ও জিন বিকৃত তথাকথিত; উন্নত জাতের ফসল ও সব্জি চাষের প্রসার ঘটানোর জন্য আগ্রাসী বাণিজ্যিক ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এতে আমাদের কৃষিতে উফশী ও জিন বিকৃত শস্য ও সব্জির বিস্তার কৃষি থেকে কৃষকদের চিরায়ত মালিকানা উচ্ছেদ করবে এবং বীজ এবং অন্যান্য উপকরণের জন্য কৃষকদেরকে স্থায়ীভাবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভরশীল করে তুলবে।

দ্বিতীয়ত, গবেষণা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার ছদ্মাবরণে উন্নত দেশের বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো আমাদের দেশের প্রাকৃতিক জৈব সম্পদ লুণ্ঠন করবে। জনগণের চিরায়ত কৃষিজ জ্ঞানকে প্যাটেন্টের মাধ্যমে দখল করে নিতে চাইবে। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাইসটেক কোম্পানি কর্তৃক ভারত-পাকিস্তানে উৎপাদিত বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠমানের চাল 'বাসমতি' প্যাটেন্ট নিজেদের নামে নিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা। এই দুই দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনগণ ও বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা কার্যকর হয়নি। একইভাবে নিমের মতো একটি ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের প্যাটেন্ট করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের ডাব্লু আর গ্রেস কোম্পানি। তাদের দাবি নিমের ঔষধিগুণ নাকি তারাই আবিষ্কার করেছেন অথচ শত শত বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষ নিমকে ব্যবহার করছে নানা প্রকার রোগব্যাধি নিরাময় ও শস্যের কীটপতঙ্গ দমনে। এই বিষয়টি নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধের এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

ইনসিডিন আরো বলছে, ট্রিপস জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির সৃষ্ট করছে।

**ট্রিপস চুক্তি বাস্তবায়নসীমা**

| | |
|---|---|
| উন্নত দেশ | ১ জানুয়ারি ২০০৫ [আরো এক বছর বাড়তি দেয়া হয় অভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুন সমন্বয় করার জন্য] |
| উন্নয়নশীল দেশ | ১ জানুয়ারি ২০০০ |
| এলডিসি | ১ জানুয়ারি ২০০৬<br>১ জানুয়ারি ২০১৬ [চিকিৎসা বিষয়ক পেটেন্টের জন্য] |

কেননা, এই চুক্তি উন্নত দেশের ঔষধপত্র উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে তাদের আবিষ্কৃত নতুন ওষুদপত্রের মালিকানা দীর্ঘকাল একচ্ছত্র অধিকারে সংরক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছে। ঔষধপত্রের উপর পূর্বেকার প্যাটেন্ট সময়সীমা ১৫ বছরের পরিবর্তে এই চুক্তি কোম্পানিগুলোকে পঞ্চাশ বছরের নিরঙ্কুশ প্যাটেন্ট অধিকার প্রদান করেছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা এই মনোভাবের মধ্য দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য-সেবা ও চিকিৎসা পাওয়ার মানবিক অধিকারকে অস্বীকার করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া মুনাফার অধিকারকে উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। প্যাটেন্ট সংক্রান্ত মতবিরোধ এবং যুক্তরাষ্ট্রের একগুয়েমির কারণে শুধু ২০০০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার দেড় কোটিরও বেশি এইডস রোগী বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারায়।

**এলডিসির চ্যালেঞ্জ**

তথাপি বলতে হয়, গরীব দেশগুলোর জন্য চুক্তি সৃষ্ট কিছু প্রতিবন্ধকতাকেও অস্বীকার করার জো নেই। বিশেষ করে এখনো যে সব দেশ প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনে পিছিয়ে আছে তাদের সমস্যাই হবে বেশি। ট্রিপসের উদ্দেশ্যের সঙ্গে বাস্তব অমিলও খুঁজে পাওয়া যায়। বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তরের বিষয়টি ট্রিপসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এ থেকে স্বল্পোন্নত দেশগুলো লাভবান হতে পারছে না। বরং স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে বিপুল অর্থ চলে গেছে উন্নত দেশগুলোতে। যেহেতু প্রযুক্তিতে এগিয়ে আছে তারাই।

কৃষি, ওষুধ, তথ্য প্রযুক্তির মত বিষয়গুলোতে ট্রিপস চুক্তি যে ভাবে করা হয়েছে, তার বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্ত হবে স্বল্পোন্নত দেশগুলো। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আসন্ন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হংকং সম্মেলনে এ নিয়ে দরকষাকষি না হলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ গুনতে হবে একথা নিদ্বির্ধায় বলা যায়। এসব খাতে ট্রিপস চুক্তির বাস্তবায়ন জ্ঞানের প্রসারকেও সীমিত করবে। ওষুধ শিল্পের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, জনস্বাস্থ্যও হুমকির মুখে পড়বে। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো পেটেন্ট মেনে ওষুধ উৎপাদন করতে গেলে এই জরুরি পণ্যটিও দুর্লভ হয়ে পড়বে। উচ্চবিত্ত শুধু ব্যয়বহুল ওষুধ কেনার ক্ষমতা রাখবে। পেটেন্ট আইনে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেলে উদ্যোক্তাদের পক্ষে সুলভ মূল্যে ওষুধ সরবরাহ সম্ভব হবে না। এখানে আর্জেন্টিনায় পরিচালিত এক গবেষণা ফলাফলের উদ্বৃতি দেয়া যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, পেটেন্ট প্রবর্তনের কারণে বছরে আর্জেন্টিনার ব্যয় বাড়বে ১৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার। ক্রয়ক্ষমতার অভাবে ওষুধের ব্যবহার কমে যাবে ৪৫ দশমিক ৫ শতাংশ। প্রকারান্তরে আয় বাড়বে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর।

তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। স্বল্পোন্নত দেশগুলো এখনো তথ্যপ্রযুক্তিতে স্বকীয়তা অর্জন করতে পারেনি। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষে সফটওয়্যারের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি উঠেছিল। কিন্তু উন্নত দেশগুলোর তীব্র বাধার মুখে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

কৃষিতেও একই অবস্থা। উন্নত বিশ্ব কৃষি উপকরণ সরবরাহে ভর্তুকি, উৎপাদনে ভর্তুকি এবং রপ্তানিতে ভর্তুকির একটা বড় অংশই ২০০০ সালের মধ্যে তুলে নেয়ার কথা থাকলেও তা করেনি। ভর্তুকি একেবারে প্রত্যাহার করে নিতে ২০০৩ সালের মধ্যে আরেকটি চুক্তি হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। যেমন কেউ যদি ধানের একটা নতুন জাত আবিষ্কার করে মেধাসম্পদ সংরক্ষণের জন্য যায়, তখন দেখা যাবে উন্নত কোন দেশ বলবে তারা আগেই একই বৈশিষ্ট্যের ধান জাত আবিষ্কার করেছে এবং তা আন্তর্জাতিকভাবে সংরক্ষিত করা আছে। এসব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বলা যায়, মেধাসম্পদ সংরক্ষণ আইন পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হলে উন্নয়নশীল বিশ্বকে বেশ মোটা অঙ্কের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যয় গুনতে হবে। তাই এসব দেশের উচিত হবে সংরক্ষণ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার সুযোগ নেয়া। প্রয়োজনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ঐকবদ্ধ হয়ে নিজেদের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করতে হবে। যেমন জোট গঠন করেছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পেরু, মিসর, ইরান, ভেনিজুয়েলাসহ ১৪টি দেশ। এসব দেশ 'উন্নয়ন বন্ধুদের গ্রুপ' নামে জোট গঠন করেছে। তাদের অভিযোগ, ওয়াইপো'র অধিক এবং উন্নততর মেধাসম্পদ অধিকার সংরক্ষণের ফলে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং আনুষঙ্গিক জ্ঞান ও কৌশলের বিস্তৃতি বাধাগ্রস্ত হলেও এ বিষয়টি আলোচনায় উপেক্ষিত।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রত্যাশা আগামী ডিসেম্বরে ডব্লিউটিও সম্মেলনে 'ট্রিপস চুক্তির' উপর বিস্তারিত আলোচনা হবে। এজন্যে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে।

# দক্ষিণ এশিয়ার অভিন্ন ইস্যুর সন্ধানে

**জাকির হোসেন**

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মন্ত্রী পর্যায়ের ৬ষ্ঠ সম্মেলন আগামী ১৩ থেকে ১৮ ডিসেম্বর হংকংয়ে অনুষ্ঠিত হবে। ডব্লিউটিওর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য ওই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এই বৈঠকে কোনো অভিন্ন অবস্থান নিতে পারে কি না এই নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা চলবে। এর জন্য প্রয়োজন সবাই লাভবান হবে এমন কিছু কৌশল নির্ধারণ এবং সেই কৌশল অনুযায়ী ডব্লিউটিওতে দরকষাকষি করা। কৃষি, অ-কৃষিজাত পণ্যের বাজার প্রবেশ এবং শ্রমের অবাধ যাতায়াতের মতো ইস্যুগুলোতে কিছু অভিন্ন অবস্থান করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো ডব্লিউটিওতে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। গত জুলাইয়ে নেপালের পোখারায় অনুষ্ঠিত 'রোড টু হংকং' শিরোনামে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ সেমিনারে আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞরা দক্ষিণ এশিয়ার জন্য একটি স্বতন্ত্র অবস্থানের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

কানকুনে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও'র পঞ্চম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয়, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোরও একই অবস্থা। বাণিজ্য উদারীকরণ ইস্যুতে কোন পক্ষীয় অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার নেয়া উচিত তা নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। একক, দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক নাকি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সমঝোতায় তারা লাভবান হবেন তা নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। তবে বেশির ভাগ গবেষণা সংস্থা কিংবা বাণিজ্য বিশ্লেষকরা মনে করেন, বাণিজ্য উদারীকরণে বহুপাক্ষিক চুক্তি বা সমঝোতায় ঝুঁকি কম। দক্ষিণ এশিয়ার বেশির ভাগ দেশের অর্থনীতিই বড় ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক অবস্থানে নেই।

তবে ভারত উন্নয়নশীল দেশগুলোর এবং বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নেতৃত্বে থাকলে দক্ষিণ এশিয়ার আলাদা ব্লক হিসেবে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা নেই। দোহা ও কানকুন সম্মেলনে এ কারণে দক্ষিণ এশিয়ার কোনো স্বতন্ত্র অবস্থান ছিল না। এ অঞ্চলের ৭টি দেশ উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত উভয় ক্যাটাগরিতেই বিভক্ত। ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা উন্নয়নশীল দেশ। অপরদিকে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ স্বল্পোন্নত দেশ। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে ঐকমত্যে পৌঁছানো খুবই কঠিন বিষয়। এ কারণে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ঐক্য প্রয়োজন। বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার বিবদমান সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়ার সমন্বিত অবস্থানের পক্ষে অন্তরায়। এ অবস্থায় অর্থনৈতিক স্বার্থকে রাজনৈতিক টানাপড়েনের বাইরে চিন্তা করতে হবে।

## উরুগুয়ে রাউন্ডের আওতায় কৃষি বিষয়ে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলোর প্রতিশ্রুতির সার সংক্ষেপ

| **বাজার প্রবেশাধিকার** | **উন্নত দেশ** | **উন্নয়নশীল দেশ** | **এলডিসি** |
|---|---|---|---|
| শুল্ক হ্রাস | গড়ে ৩৫% | গড়ে ২০% | প্রযোজ্য নয় |
| | কমপক্ষে ১৫% | কমপক্ষে ১০% | প্রযোজ্য নয় |
| সময়-সীমা | ৬ বছর [১৯৯৫-২০০০] | ১০ বছর [১৯৯৫-২০০৪] | প্রযোজ্য নয় |
| **অভ্যন্তরীণ ভর্তুকি** | **উন্নত দেশ** | **উন্নয়নশীল দেশ** | **এলডিসি** |
| হ্রাসের হার | ২০% | ১৩.৩% | প্রযোজ্য নয় |
| সময়-সীমা [১৯৯৫-২০০০] | ৬ বছর [১৯৯৫-২০০৪] | ১০ বছর | ঐ |
| ন্যূনতম সীমা (অনুমোদিত ভর্তুকি) | ৫% | ১০% | ১০% |
| বিশেষ ছাড় | অনুচ্ছেদ ৬.২-এর আওতায় সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগ ও বহুমুখীকরণ ভর্তুকি | | |
| **রপ্তানি ভর্তুকি** | **উন্নত দেশ** | **উন্নয়নশীল দেশ** | **এলডিসি** |
| হ্রাস | মূল্যের ৩৬% | মূল্যের ২১% | প্রযোজ্য নয় |
| | পরিমাণের ২৪% | পরিমাণের ১৪% | প্রযোজন নয় |
| সময়-সীমা | ৬ বছর [১৯৯৫-২০০০] | ১০ বছর [১৯৯৫-২০০৪] | ঐ |
| বিশেষ ছাড় | অনুচ্ছেদ ৯.৪.-এর আওতায় বিপণন ও পরিবহন ভর্তুকি | | |

বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের জন্য সবচাইতে বড় প্রয়োজন পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা এবং জনশক্তি রপ্তানি খাতে অধিকতর সুযোগ পাওয়া। এছাড়া স্বল্পোন্নত দেশ বিশেষত কৃষিপ্রধান স্বল্পোন্নত দেশে ভর্তুকি বহাল কিংবা বাড়ানোর পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান থাকা উচিত বলে মনে

**কৃষি চুক্তির তিন স্তম্ভ**

*ক. বাজার প্রবেশাধিকার*
শুল্ক হ্রাস, শুল্ক কোটা, বিশেষ সংরক্ষণ

*খ. অভ্যন্তরীণ সমর্থন*
আম্বর বাক্স: হ্রাসের প্রতিশ্রুতি
নীল বাক্স: উৎপাদন সীমিতকরণ
সবুজ বাক্স: অনুমোদিত

*গ. রপ্তানি প্রতিযোগিতা*
পরিমাণ হ্রাস
মূল্য হ্রাস

করছেন স্থানীয় কিছু প্রতিষ্ঠান। উন্নয়ন বিশ্লেষকরা মনে করেন, ডব্লিউটিও আলোচনায় 'মোড ফোর' অর্থাৎ উন্নত দেশে আধাদক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ইস্যুতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো একটি স্বতন্ত্র কৌশল নিতে পারে। কারণ এ অঞ্চলের সবগুলো দেশেই রয়েছে রপ্তানিযোগ্য মানব সম্পদ। কৃষিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর স্বার্থের ভিন্নতা রয়েছে। কৃষি ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তানের স্বার্থ শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপালের মতো নয়। যেমন : ভারত ও পাকিস্তান কৃষিপণ্য রপ্তানি খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তারা চায় রপ্তানি ক্ষেত্রে আরো সুবিধা। অপরদিকে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপাল স্থানীয় চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে অনেকটা সংরক্ষণবাদী। উন্নত দেশের কৃষি খাতে ভর্তুকি অব্যাহত থাকলে তা বাংলাদেশের জন্য আপাত লাভজনক। কারণ বাংলাদেশ এখনও খাদ্য আমদানি করে থাকে। আবার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আমাদের মতো দেশগুলোকে কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি না দেয়ার বা কমানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করে আসছে। ইউরোপ, আমেরিকা যখন কৃষি খাতে বিপুল পরিমাণ নগদ ভর্তুকি দিচ্ছে তখন বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশের কৃষি খাত থেকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নির্দেশে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রত্যাহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো দেশে কৃষিতে ভর্তুকির পরিমাণ ১ শতাংশেরও কম।

ডব্লিউটিওতে বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোচনা কিংবা দর কষাকষি হয়ে যাকে। হংকং বৈঠকে কৃষি, অকৃষি পণ্যের বাজার প্রবেশ, শ্রমের অবাধ যাতায়াত, ট্রিপস ও জনস্বাস্থ্য, বিশেষ ও পার্থক্যমূলক সুবিধা,

*দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের জন্য হংকং সম্মেলনকে সামনে রেখে গত জুলাই মাসে নেপালের পোখারায় কাঠমাণ্ডুভিত্তিক সাউতি এবং নয়াদিল্লিভিত্তিক সেন্টাড আয়োজিত প্রশিক্ষণ সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ*

বাণিজ্য উদারীকরণসহ কিছু বিষয় দক্ষিণ এশিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষি ইস্যুতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে অবশ্যই তাদের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিগুলোকে বিবেচনায় আনতে হবে। কৃষি বাণিজ্য আলোচনায় এ অঞ্চলের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। ট্রিপল ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে এ অঞ্চলের সরকারগুলোর উচিত বহুপক্ষীয় পর্যায়ে একটি অভিন্ন অবস্থান তৈরি করা। সবার জন্য ওষুধ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, ওষুধ শিল্প কারখানায় অধিকতর কমপ্লায়েন্স, ট্রিপস+ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য বহুপক্ষীয় ও দ্বিপাক্ষিক চাপ রোধ করতে একটি ঐকমত্য প্রয়োজন। মোড ফোরের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো যাতে আরো উদার হয় তার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো একত্রে প্রস্তাব আনতে পারে। ভিসা প্রদানে নানা ধরনের কড়াকড়ি আরোপ রোধে তারা দরকষাকষি করতে পারে।

## বিশ্বায়নের বৈষম্যমূলক ফল

- বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫% বাস করে ধনী দেশগুলোয়; ৭% পরিবর্তনশীল দেশগুলোয় আর বাকি ৭৮% গরিব দেশগুলোয়।
- বিশ্বের ২০% লোক (ধনী ও পরিবর্তনশীল দেশগুলো) বর্তমানে গোটা পৃথিবীর সমগ্র সম্পদের ৮৬% ভোগ করে যা '৯০-র দশকে ছিল ৮০%।
- '৯০-র দশকের তুলনায় এখন বিশ্বে ৪৪টি দেশ বেশি গরিব হয়েছে। জনগণের মাথাপিছু আয় গড়ে ৬ হাজার মার্কিন ডলার।
- '৯০-র দশকের তুলনায় এখন বিশ্বে ২১টি দেশে জনগণ অধিক খাদ্যাভাবে ভুগছে।
- '৯০-র দশকের তুলনায় এখন বিশ্বে ১৪টি দেশে পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে।
- '৯০-র দশকের তুলনায় এখন বিশ্বে ১২টি দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার কমে গেছে।
- '৯০-র দশকের তুলনায় এখন বিশ্বের ৩৪টি দেশে মানুষের গড় আয়ু কমে গেছে।
- '৯০-র দশকের তুলনায় এখন বিশ্বের ২১টি দেশের মানব উন্নয়ন সূচক নেমে গেছে।
- গরিব দেশগুলোর প্রথাগত রপ্তানি সামগ্রী (কৃষি ও খনিজ সম্পদ) এখন বিশ্বের মোট রপ্তানি বাজারের মাত্র ২০% যা '৯০-র দশকে ছিল ৭০%।
- বিশ্বের মাত্র ১৫% মানুষ সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা ভোগ করতে পারছে।
- ধনী-গরিব দেশগুলোয় বসবাসকারী মানুষের আয় অনুপাত গড়ে এখন ১০০:৪.৩।

# সেবাখাতে মুক্ত বাণিজ্য ও বাংলাদেশ

**শারমীন রিনভী**

কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়াসহ বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশের শিল্প পণ্যের গুণগত মান ও প্রযুক্তির উত্তরোত্তর উন্নতির ফলে সত্তরের দশকে আমেরিকাসহ বেশ কিছু উন্নত দেশ শিল্প বাণিজ্যে ধাক্কা খেতে শুরু করে। এই বিপর্যয় পুষিয়ে নিতে আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্ব নতুন এক পন্থা বের করে। আর তা হচ্ছে সেবা খাতকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা'র (WTO) আওতায় আনা এবং সেবা খাতের বাণিজ্য উন্মুক্ত করা। এ লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে শুরু হওয়া উরুগুয়ে রাউন্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে সেবা খাতকে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার অধীনে আনার আলোচনা আরম্ভ হয়। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনা শেষে সেবা খাত সংক্রান্ত চুক্তি গ্যাটস (জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস) সম্পাদিত হয়। ডব্লিউটিওর মুঠোর মধ্যে চলে আসে সেবা খাত।

উরুগুয়ে রাউন্ডের সবচেয়ে বিতর্কিত ইস্যুই ছিলো এই গ্যাটস চুক্তি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঘোরতর আপত্তির কারণে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বিতর্ক শেষ পর্যন্ত তিক্ততায় পৌঁছায়। এরপর সেবা খাতের নির্দিষ্ট কিছু উপখাতে দেশগুলো ছাড় দিতে বা পজেটিভ লিস্ট এপ্রোচে বাজার উন্মুক্ত করার প্রস্তাবে উন্নয়নশীল বিশ্ব নিমরাজি হয়। এছাড়া উন্নয়শীল বিশ্বের পেশাজীবী এবং দক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিকের যাতায়াত সাময়িক ভিত্তিতে অবাধ করার প্রস্তাবে তারা কিছুটা নমনীয় হয়। এটিই হয়ে দাঁড়ায় উন্নয়নশীল দেশের প্রধান শর্ত। সেই সঙ্গে বিশেষ কোনো সেবা উপখাতে অবনতি শুরু হলে দেশটি সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ বা সেইফ গার্ড মেজারস নিতে পারবে এমন প্রস্তাবও উন্নয়নশীল দেশগুলো শেষতক মেনে নেয়। তবে বর্তমানে সেবা খাত বিশ্ব অর্থনীতির সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের খাত। এক হিসাবে দেখা গেছে, বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৬০ শতাংশই আসে এ খাত থেকে। যা মোট কর্মসংস্থানের ৩০ শতাংশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হিসাবে ২০০২ সালে বিশ্ব বাণিজ্যিক সেবা রপ্তানির পরিমাণ ছিলো ১.৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

**সেবা খাতের চুক্তি গ্যাটস**

গ্যাটস চুক্তিতে সেবা খাতকে ১১টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে পরিবহন, যাতায়াত, যোগাযোগ, নির্মাণ, বীমা, কম্পিউটার ও তথ্য এবং বিনোদন ও সাংস্কৃতিক সেবা উল্লেখযোগ্য। গ্যাটসের অধীনে সেবা সরবরাহের চারটি পন্থা বা মোড চিহ্নিত করা হয়। এগুলো হলো :

**মোড-১ আন্তঃসীমান্ত সরবরাহ :** এ পন্থায় সেবা সরবরাহকারী ও সেবাগ্রহীতা উভয়েই নিজ নিজ দেশে অবস্থান করে সেবা বিনিময় করতে পারে। যেমন ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং, টেলিফোন সেবা, টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে বিনোদন ইত্যাদি। তবে এ ক্ষেত্রে দু'দেশেরই তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা উন্নতমানের হতে হয়। ফলে স্বল্পোন্নত দেশ এই ব্যবস্থায় ততটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না।

মোড-২ প্রবাসের সেবা : এ পন্থায় সেবাগ্রহীতাকে সেবা সরবরাহকারীর দেশে গিয়ে সেবা গ্রহণ করতে হয়। যেমন- পর্যটন, বিদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ। মোড ২-এর ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলো সেবা বাণিজ্যে ভূমিকা রাখতে পারে, কিছুটা লাভবানও হয়।

**মোড-৩ বাণিজ্যিক উপস্থিতি :** এটি মোড-২-এর বিপরীত। অর্থাৎ সেবা সরবরাহকারী সেবাগ্রহীতার দেশে গিয়ে সেবা প্রদান করতে পারে। যেমন- বিদেশী ব্যাংক, বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে সেবা প্রদানের জন্য অনেক বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। ফলে অনেক স্বল্পোন্নত দেশই পুঁজির অভাবে নিজ দেশের প্রতিষ্ঠানের শাখা অন্য দেশে খুলতে পারে না। তাই স্বল্পোন্নত দেশের সেবা বাণিজ্যে মোড ৩-এর সুযোগ ততটা লাভজনক নয়।

মোড-৪ শ্রমের যাতায়াত অবাধ : এ অবস্থায় এক দেশের পেশাজীবী বা শ্রমিক অন্য দেশে গিয়ে শ্রম দেয়ার মাধ্যমে সেবাদান করে। এই পন্থায়ই স্বল্পোন্নত দেশ সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারে।

সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা গেছে, মোড-৩-এর মাধ্যমে উন্নত বিশ্ব সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সেবা বাণিজ্যে অর্ধেকের বেশি আয় সংঘটিত হচ্ছে এ পন্থায়। এ ছাড়া প্রথম পন্থায় এক চতুর্থাংশ এবং দ্বিতীয় পন্থায় এক পঞ্চমাংশ সেবা বাণিজ্য হচ্ছে। তবে মোড-৪-এর আওতায় সেবা বাণিজ্য অত্যন্ত কম, মাত্র ১ শতাংশের কাছাকাছি।

শুরু থেকে মোড-৪-এর বিরোধিতা করে উন্নত বিশ্ব বেশ কিছু যুক্তি উত্থাপন করে। তারা মনে করে, শ্রমিকের শ্রেণী বিন্যাস না থাকায় কোন কোন শ্রমিক যাতায়াত করতে পারবে তা স্পষ্ট নয়। এ ছাড়া বাইরে থেকে শ্রমিক এসে নিজেদের শ্রম বাজারে অসমতা সৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে পেশাজীবী ও শ্রমিকরা স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এতে করে নষ্ট হবে নিজ দেশের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, ছড়িয়ে পড়তে পারে বিভিন্ন রোগ বালাই। বর্তমানে এ যুক্তিগুলোর সঙ্গে উন্নত দেশ আরো একটি নতুন যুক্তি জুড়ে দিয়েছে। তাহলো নিরাপত্তার ইস্যু।

তবে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো মোড-৪-এর পক্ষে বেশ জোরেসোরে অবস্থান নিয়েছে। এমন কি তারা মোড-৪ না মানলে কোনো আলোচনাই করবে না বলেও হুমকি দিয়েছে। সম্প্রতি ভারত উন্নত বিশ্বের

**'স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার উন্মুক্ত করায় বাংলাদেশ ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য। দেশের জাতীয় আয়ে সেবা খাতের অবদান ও সেবা রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধিতে শ্রমের অবাধ চলাচলের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ অনেক খাতকে উন্মুক্ত করেছে। তাই সেগুলোকে অফারের তালিকায় দিয়ে, নিজের সুবিধা মতো খাতে উন্মুক্ত সুবিধা চেয়ে বাংলাদেশের অনুরোধ জানানোই উচিত আর তা করতে হবে দ্রুত'**

**- ড. অনন্য রায়হান**

যুক্তি খন্ডন করতে গিয়ে ঐ সব দেশে গ্যাটস ভিসা চালুর প্রস্তাব দিয়েছে।

তবে গ্যাটস চুক্তিত এখনো বেশ কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। প্রথমত, এর আওতায় সেবাখাতের শ্রেণীবিন্যাস থাকলেও সেবা প্রদানকারীদের শ্রেণী বিন্যাস নেই। যা থাকলে সমঝোতা সহজ হবে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ISCO-88-এর শ্রেণী বিন্যাস গ্রহণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, গ্যাটসের আওতায় সেবা গ্রহণ করতে হলে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা (Economic need test) বা ENT দিতে হয়। অর্থাৎ দেশের মধ্যে সেবা দেয়ার জন্য কাউকে খুঁজে না পেলে তারপরই বিদেশ থেকে সেবা নেয়া যাবে। এটি বাতিলের দাবি জানিয়েছে স্বল্পোন্নত দেশ। তৃতীয়ত, পারস্পরিক স্বীকৃতি ব্যবস্থা নেই। ফলে এক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বা অন্যদের স্বীকৃতি অন্য দেশ না দিলে সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে অসঙ্গতি দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে স্বীকৃতি সর্বজনীন করার দাবি রয়েছে এলডিসিগুলোর। চতুর্থত, উরুগুয়ে রাউন্ডের অমীমাংসিত ইস্যুগুলো সমাধান না করে অন্যান্য আলোচনা শুরু করা। কিন্তু ডব্লিউটিওর আওতায় শর্তই ছিলো প্রথমে অমীমাংসিত আলোচনার সমাধান হবে এরপরই বাজার উন্মুক্ত করার আলোচনা শুরু হবে। বাস্তবে তা না হওয়ায় সমস্যা রয়েই গেছে।

### বর্তমান অবস্থা

২০০০ সাল থেকে সেবাখাতে উন্মুক্ত করার আলোচনা সংস্থার সেবা বাণিজ্য পরিষদে (WTO Council for Trade in Services) শুরু হয়। এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সিয়াটল ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে। ফলে মালয়েশিয়া, কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা, সেনেগালসহ উন্নয়নশীল অনেক দেশ এ আলোচনার শুরুতে উপস্থিত ছিল না। এ ছাড়া স্বল্পোন্নত দেশ এ বিষয়ে ততটা অভিজ্ঞ না হওয়ায় আলোচনায় কোনো ভূমিকাই রাখতে পারেনি।

আলোচনার প্রথম পর্যায়ে বাজার কি প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ত করা হবে সে পদ্ধতির বিষয়ে সমঝোতা হয়। এছাড়া অনুরোধ প্রস্তাব পদ্ধতি (Request offer Method) আলোচনার মূল পদ্ধতি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ঠিক করা হয় অনুরোধ প্রস্তাব পদ্ধতিতে প্রথমে দুটি দেশ দ্বিপাক্ষিকভাবে সেবার বিষয়টি নির্দিষ্ট করবে। পরবর্তীতে তা বহুপাক্ষিকভাবে করা হবে। ফলে দেশগুলো কোন কোন খাতকে উন্মুক্ত করবে তা যেমন নিজেই ঠিক করে প্রস্তাব দিতে পারে, তেমনি অপর দেশের কাছে নিজের প্রয়োজনের খাতগুলোতে সুবিধা দেয়ার অনুরোধও করতে পারে। তবে এ পদ্ধতিতে সুবিধা থাকলেও দ্বিপাক্ষিকভাবে আলোচনার ফলে উন্নত দেশ স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশকে চাপ প্রয়োগের সুযোগও

**‘ঢাকা ঘোষণায়’ মোড-৪ সহ সেবা খাতের অন্যান্য দাবি উত্থাপন করা হয় যা কানকুন সম্মেলনের ঘোষণাপত্রের খসড়ায় গুরুত্ব দিয়ে স্থান পেয়েছিল। এভাবে প্রথমবারের মতো স্বীকৃতি পায় পেশাজীবী ও শ্রমিকের অবাধ চলাচলের ইস্যুটি**

পেয়ে যায়। যা বহুপাক্ষিক ও সর্বজনীন আলোচনায় থাকে না।

২০০২ সালের জানুয়ারিতে দোহা রাউন্ডের শুরুতে অমীমাংসিত বিষয় (সুরক্ষা ব্যবস্থা, সরকারি ক্রয়, ভর্তুকি এবং যোগ্যতা, কারিগরি মানদন্ড ও লাইসেন্সের ইস্যু) আলোচনা না করে দেশগুলো অনুরোধ প্রস্তাব সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সেবাখাতের বাজার উন্মুক্ত করার বিষয়টি ধীর হয়ে যায়। অন্যদিকে স্বল্পোন্নত দেশগুলো বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফসহ দাতাসংস্থার চাপে বেশ আগেই সেবাখাতের বাজার উন্মুক্ত করার বিষয়টি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দৃষ্টিতে আনে। তারা বাজার উন্মুক্ত করার কারণে তাদের অর্থনীতিতে কি কি খারাপ প্রভাব পড়েছে প্রথমে তা নির্ণয় করার এবং এরপর প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলোচনা করার প্রস্তাব দেয়। এ ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার উন্মুক্ত করার কৃতিত্ব দেয়ারও দাবি তোলে তারা।

২০০৩ সালের এপ্রিলে এসে গ্যাটসের সার্বিক চিত্রের (২০০০ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত) পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে গ্যাটসের আলোচনা এগোয়নি। এমনকি এগোয়ানি অনুরোধ প্রস্তাবের বিষয়টিও। তখন পর্যন্ত মাত্র ৫৪টি দেশ এ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিল। যা মোট সদস্য দেশের তিন ভাগের এক ভাগ। তার ওপর বাজার উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রগুলো ছিলো বেশ দায়সারা গোছের। অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্রের বিতর্ক তুঙ্গে ওঠায় অন্যান্য আলোচনাও থেমে যায় এবং একটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়। তা হচ্ছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার উন্মুক্ত যে যে দেশ করেছে তাদের ক্রেডিট দেয়ার বিষয়টি

**সেবাখাত আলোচনার সময়সূচি**

৩০ জুন, ২০০২:
দ্বিপাক্ষিক বাজার প্রবেশাধিকার বিষয়ে প্রাথমিক অনুরোধ প্রেরণ;
৩১ মার্চ, ২০০৩:
অনুরোধের ভিত্তিতে বাজার উন্মুক্তকরণ প্রস্তাব প্রেরণ;
১ জানুয়ারি, ২০০৫:
সকল সদস্য একমত হওয়ার ভিত্তিতে বাজার উন্মুক্তকর আলোচনা সমাপ্ত।

অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কী ধরনের ক্রেডিট দেবে তা পরিষ্কার করা হয়নি।

কানুকুনে পঞ্চম মন্ত্রী পরিষদ সম্মেলনের আগে উন্নত দেশগুলো কৃষি সংক্রান্ত বির্তকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে নিজেদের পক্ষে আনতে পেশাজীবী ও শ্রমিকদের অবাধ যাতায়ত বা মোড-৪-এর ইস্যুটি মেনে নেয়। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো খাত ও পেশায় স্বল্পোন্নত দেশ মোড-৪-এর সুবিধা চায় তা সুনির্দিষ্ট করার শর্ত দেয় তারা। অন্যদিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের বেঠকের ‘ঢাকা ঘোষণায়’ মোড-৪ সহ সেবা খাতের অন্যান্য দাবি উত্থাপন করা হয় যা কানকুন সম্মেলনের ঘোষণাপত্রের খসড়ায় গুরুত্ব দিয়ে স্থান পেয়েছিল। এভাবে প্রথমবারের মতো স্বীকৃতি পায় পেশাজীবী ও শ্রমিকের অবাধ চলাচলের ইস্যুটি। অর্থনীতিবিদ ড. অনন্য রায়হানের মতে, এটি ছিলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইতিহাসে স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ মেনে নেয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল।

তিনি আরো মনে করেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার উদার করার কৃতিত্ব স্বল্পোন্নত দেশকে দেয়া, ন্যাশনাল ট্রিটমেন্টের বিশেষ ছাড় এবং স্বল্পোন্নত দেশ চাইলে বাজার নাও উন্মুক্ত করতে পারে, এমন সুযোগ ইত্যাদি স্বল্পোন্নত দেশের জন্য এক বিরাট বিজয়।

### সেবা খাত বাংলাদেশের চিত্র

২০০৪-০৫ অর্থবছরে জাতীয় আয় (জিডিপি) এ সেবা খাতের অবদান প্রায় ৫০%। এ বছর সেবা বাণিজ্যের পরিমাণ ছিলো ২৪৫৫.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা মোট পণ্য বাণিজ্যের প্রায় ১৫.১৬ শতাংশ। সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রথমেই রয়েছে পরিবহন খাত। অন্যদিকে সর্বোচ্চ সেবা আমদানি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

স্বাধীনতার পর থেকেই বিশ্বব্যাংক আইএমএফের চাপে বাংলাদেশ প্রায় সব সেবা খাতকেই উন্মুক্ত করেছে। তবে তা গ্যাটসের অধীনে নয়। ড. অনন্য রায়হান বলেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার উন্মুক্ত করায় বাংলাদেশ ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য। তিনি আরো মনে করেন, দেশের জাতীয় আয়ে সেবা খাতের অবদান ও সেবা রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধিতে শ্রমের অবাধ চলাচলের

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা ২০০৪-০৫ অর্থবছরে প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ (রেমিট্যান্স) ছিলো ৩৮০ ডলারের বেশি। যা মোট বৈদেশিক সাহায্যের দ্বিগুণ এবং মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৫০ ভাগ।

গবেষণা সংসদ ডি-নেটের নির্বাহী পরিচালক ড. অনন্য রায়হান অবশ্য সেবা খাতে সুযোগ নেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে হতাশাই ব্যক্ত করেছেন। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশকে প্রস্তাব অনুরোধ পদ্ধতিতে অনুরোধ জানানোর সময়সীমা পরবর্তীতে ছিলো ২০০৫ সালের ৩১ মে। যদিও এ সময় বাড়িয়ে অনতিবিলম্বে করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো দেশকে অনুরোধ জানায়নি বাংলাদেশ। ইতিমধ্যে মালয়েশিয়া, হংকং, জাপান যুক্তরাষ্ট্র কিংবা নরওয়ে, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুরসহ মোট ৯টি দেশ বাংলাদেশের কাছে অনুরোধ তালিকা পাঠিয়েছে। এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেবা খাতের সব উপখাতের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক ও তথ্য প্রযুক্তি খাতের, জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর সামুদ্রিক পরিবহন খাতের এবং নরওয়ে টেলিযোগাযোগ খাতের উন্মুক্ত বাজার সুবিধা চেয়েছে। ড. অন্যান্য আরো বলেন, কী কারণে বাংলাদেশ অনুরোধ জানাচ্ছে না দেশগুলোর কাছে তা বোধগম্য নয়। কেননা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ অনেক খাতকে উন্মুক্ত করেছে। তাই সেগুলোকে অফারের তালিকায় দিয়ে, নিজের সুবিধা মতো খাতে উন্মুক্ত সুবিধা চেয়ে বাংলাদেশের অনুরোধ জানানোই উচিত আর তা করতে হবে দ্রুত।'

কোন কোন খাতে সুবিধা চেয়ে বাংলাদেশ অনুরোধ জানাতে পারে এ প্রশ্নের জবাবে ড. অনন্য রায়হান জানান, মোড-৪-এর আওতায় শ্রমের অবাধ চলাচলের বিষয়ে সুযোগ চেয়ে প্রথমে বাংলাদেশের অনুরোধ জানানো প্রয়োজন। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা খাতেও উন্মুক্ত করার অনুরোধ জানাতে পারে বাংলাদেশ। তিনি আরো মনে করেন, ২০০৩ সালে কানকুন সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর যে অবস্থান গৃহীত হয়েছিল সে অবস্থানেই বাংলাদেশের থাকা উচিত।

এছাড়া বিলুপ্ত করা, পারস্পরিকভাবে স্বীকৃতি এবং অসম্পূর্ণ ইস্যুর আলোচনা অবিলম্বে শুরু করারও দাবি জানাতে হবে। আর এসব করতে হবে অন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সঙ্গে নিয়ে।

আর মাত্র দেড় মাস পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ডব্লিউটিও মন্ত্রী পর্যায়ের ষষ্ঠ সম্মেলন। প্রস্তুতির জন্য এই সম্মেলনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের নিজের ঘর গোছানোর প্রস্তুতি কতটুকু?

বাংলাদেশ কি পারবে সেবা খাতসহ বিভিন্ন বিষয়ে দাবি আদায়ে সরব ভূমিকা রাখতে? এ প্রশ্নগুলো থেকেই যাচ্ছে।

# সেবা বাণিজ্য সমঝোতা-আলোচনা মানবাধিকার হরণ করছে : এ্যাকশনএইড

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার **সেবা বাণিজ্য বিষয়ক সাধারণ সমঝোতা** বা গ্যাটস সেবাখাতে সরকারের তথা রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাপকভাবে পুনর্বিন্যাস করে জনস্বার্থ ও মানবাধিকার হরণ করছে বলে দাবি করেছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এ্যাকশনএইড। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সেবা যেমন- পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সেবাসমূহ নিশ্চিত করতে সরকারের একটি মুখ্য ভূমিকা আছে। অতিজরুরি জনসেবাসমূহ পাওয়ার সুযোগ একটি মৌলিক মানবাধিকার যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তারপরও বিশ্ব অর্থনীতিতে সেবা বাণিজ্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**গ্যাটসের আওতায়**

শিক্ষা, স্বাস্থ্য- এ সমস্ত জনসেবা পাওয়ার সুযোগ একটি মৌলিক মানবাধিকার যা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না। অথচ গ্যাটসের আওতায় এসমস্ত সেবাসমূহ উদারীকরণ করলে ঐসমস্ত সেবায় জনগণের প্রবেশাধিকার হুমকির মুখে পড়বে বলে এ্যাকশনএইড মনে করছে। কেননা চাহিদা ও যোগানের বাজার শক্তিগুলো শুধু মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে বিবেচনা করে এবং দরিদ্র মানুষকে এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। আবার গ্যাটস আবশ্যিকভাবে একটি বিনিয়োগ চুক্তি। এটা মূলত বিনিয়োগকারীর স্বার্থ রক্ষা এবং বিদেশী সেবা প্রদানকারী কর্পোরেশনগুলোর জন্য অন্যান্য দেশে সেবাখাতের উদারীকরণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে বলে এ্যাকশনএইড দাবি করেছে। উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে থেকে সেবাখাতে যে প্রতিশ্রুতিগুলো চাচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে- অর্থ ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ/জ্বালানি, পরিবেশ, পানি, পর্যটন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা।

**দাবি**

এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ সেবা উদারীকরণে লাভ-ক্ষতি নির্ধারণের জন্য একটি ব্যাপক খাতওয়ারী মূল্যায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশগুলো যেন কোনো প্রতিশ্রুতি না দেয় তার দাবি করেছে। আন্তর্জাতিক এই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানটি মনে করে, ধনী দেশগুলো শ্রমের মান নির্ধারণে কোনো চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। অন্যদিকে বাইরের সেবাপ্রদানকারী সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর নীতি নমনীয়তার সুযোগ থাকা উচিত। তাছাড়া গ্যাটসের নিয়মনীতির আওতায় দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর জন্য কার্যকরি অগ্রাধিকারমূলক ও বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে এবং 'উদারীকরণ প্রতিশ্রুতি' থেকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি, কৃষি সম্প্রসারণ, পরিবেশ ইত্যাদি সামাজিক খাতগুলি বাদ দিতে হবে। এ্যাকশনএইড আরো বলছে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর রপ্তানি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট খাত ও সরবরাহ পন্থায় বাজার প্রবেশাধিকার দিতে হবে, বিশেষত, মোড-৪-এর আওতায় আধা-দক্ষ ও স্বল্প-দক্ষ শ্রমিকের অবাধ যাতায়াতের বিধান থাকা।

**দুটি ঘটনা**

* পানি ব্যবস্থাপনা ব্যক্তি মালিকানাধীন হওয়ার ফলে ২০০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ৫,০০,০০০ লোককে তিন মাসের বেতন ছাড়া বাদ দেওয়া হয়। কাজ হারিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত পুকুর ও লেকের দূষিত পানি পান করতে বাধ্য হয়। সরকারি ব্যয় পুনরুদ্ধারের নামে এ প্রক্রিয়া চালু করা হয়। ৩৪ বছরের জেনিফার মাকোয়াতসানি তার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, 'পয়সার বিনিময়ে পানির ব্যবহার আমাদের পরিবারকে খরচের অগ্রাধিকার নির্ধারণে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। এটা ভাবতে কষ্ট হয় যে, আমাদের পানি কিনতে হয়। আপনি চিন্তা করুন, যদি আপনার কাছে পয়সা থাকে তাহলে আপনি কোনটি কিনবেন, পানি না রুটি?
* মৎস্যখাত বাণিজ্যিকীকরণের ফলে পাকিস্তানের স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী মাছ উৎপাদন, মূল্য নির্ধারণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ - এ সমস্ত কাজ ও প্রক্রিয়া থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। স্থানীয় চাষীরা যারা মূলত ছোট নৌকার সাহায্যে পারিবারিকভাবে মাছ ধরার কাজে যুক্ত ছিল তারা এখন আর বাণিজ্যিক মাছ আহরণের সঙ্গে পেরে উঠছে না এবং স্থানচ্যুত হচ্ছে। মাছ রপ্তানিকারক কোম্পানিগুলো বাজারে একক আধিপত্য বিস্তার করছে। ব উদারীকরণের নতুন নীতির ফলে নারীরাও ক্ষতির শিকার হচ্ছে। কেননা স্থানীয় ঐতিহ্যগত মাছ আহরণ প্রক্রিয়ায় নারীরা জাল বোনা, পরিষ্কার করা, মাছ শুকানো ও স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা- এ সমস্ত কাজের মাধ্যমে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে অংশীদার। উদারীকরণ ও আধুনিকীকরণের প্রভাবে এই নারীরা আজ দারুণ হুমকির মুখে।

## ইনসিডিনের প্রচারাভিযান

# আমাদের কৃষি, আমাদের প্রাণ

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনসিডিন বাংলাদেশের আয়োজনে 'আমাদের কৃষি আমাদের প্রাণ'– স্লোগান সামনে রেখে গত ২০ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হলো সংবাদ সম্মেলন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ১৩-১৮ ডিসেম্বর, ২০০৫ হংকংয়ে অনুষ্ঠেয় মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনকে ঘিরে, কৃষিবিষয়ক প্রচারণা ও দেশের বিভিন্ন এলাকায় আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কৃষি পরামর্শ সভার মতামতের ভিত্তিতে 'গণমানুষের পত্র'র মোড়ক উন্মোচন ও 'আমাদের কৃষি আমাদের প্রাণ' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রচারণা কর্মসূচির সূচনা হলো এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। সংবাদ সম্মেলনে ইনসিডিন বাংলাদেশের মাসুদ আলী, সূচনা বক্তব্য রাখেন এবং ইনসিডিন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক রতন সরকার মূল বক্তব্য পাঠ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তিতে কৃষি বাণিজ্য শব্দটা আড়াল করে রেখেছে খাদ্য নিয়ে ব্যবসা করার বিষয়টি। পৃথিবীর দেশে দেশে খাদ্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে মূলত নিজ নিজ দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য। বিশ্বে যত খাদ্য উৎপাদিত হয় তার মাত্র ১০ শতাংশ নিয়ে চলে ব্যবসা বাণিজ্য। কিন্তু বাণিজ্যেও বাকি থাকা ৯০ শতাংশ কৃষি উৎপাদনও চলে আসছে এই চুক্তির নিয়ন্ত্রণে। এর ফলে দেশে দেশে

*বক্তব্য রাখছেন ইনসিডিনের একেএম মাসুদ আলী*

কৃষিপণ্য আমদানির ওপর শুল্ক কমেছে এবং বেড়েছে আমদানির পরিমাণ। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় কমেছে খাদ্যশস্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজ উৎপাদন। সারা বিশ্বে কৃষি নিয়ে যত বাণিজ্য হচ্ছে তার ৮৫-৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে মাত্র পাঁচটি বড় কোম্পানি। কৃষি বাণিজ্যের সিংহভাগ লাভ শুষে নিচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো।

মূল বক্তব্য পাঠ করতে গিয়ে, ইনসিডিন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক, রতন সরকার বলেন, কৃষি চুক্তি স্বাক্ষর করার অনেক আগেই বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সরকারই মানবাধিকারের সার্বজনীন সনদে স্বাক্ষর করেছেন। এই সনদ অনুযায়ী প্রতিটি দেশের সরকার তার নাগরিকদের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে বাধ্য। মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের শতকরা ৬০ ভাগ এবং সমগ্র পৃথিবীতে ২৭০ কোটি লোকের জীবিকা নির্ভরশীল কৃষির উপর। তিনি বলেন, কৃষি চুক্তির পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করে দেখতে হবে তা জনগণের জীবন ও খাদ্য নিরাপত্তার অধিকারকে খর্ব করছে কিনা? এ ধরনের মূল্যায়নের ভিত্তিতে, চুক্তিটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা ছাড়া আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সরকারকে বলতে হবে, চুক্তি বাস্তবায়নের সব অঙ্গীকার আমরা মুলতবি রাখছি। একই সঙ্গে কৃষি বাণিজ্য উদারীকরণের অন্য কোনো নতুন অঙ্গীকার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

একতরফাভাবে উন্নত বিশ্বের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের কৃষিপণ্য প্রবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত সব শুল্ক ও অশুল্কজাত বাধা তুলে নিতে হবে।

স্বল্পোন্নত দেশের কৃষকদের জীবন ও জীবিকার তথা নাগরিকদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, সব ধরনের ভর্তুকি দেওয়ার স্বাধীনতাকে কৃষি চুক্তির খবরদারির বাইরে রাখতে হবে।

কৃষি চুক্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষকদের মতামত গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এ ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তাকল্পে ইনসিডিন বাংলাদেশ কৃষকের মতামত সংগ্রহের যে উদ্যোগ নিয়েছে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবে।

আমাদের হংকংমুখী বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল কৃষক প্রতিনিধি ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দেশের বিভিন্ন কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের মাঝ থেকে সত্যিকার অর্থে ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হলে আমাদের প্রতিনিধি দল হবে নৈতিকভাবে শক্তিশালী।

সেই সঙ্গে ধারাবাহিক কর্মসূচিতে পরিবেশবান্ধব কৃষি নিশ্চিত, খাদ্য অধিকার, শ্রম অধিকার, শিশু অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণের সংকল্প ও সংগ্রাম কিভাবে সংশ্লিষ্ট তা উল্লেখ করেন। তিনি সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের এ ব্যাপারে সচেতন থাকার আহবান জানান এবং সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

## বাংলাদেশ কৃষিতে কত ভর্তুকি দেয়?

সরকার বেশ জোরেশোরে বলে থাকে যে, কৃষিতে হাজার কোটি টাকার বেশি ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২০০ কোটি টাকা। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৬০০ কোটি টাকা। আর ২০০২-০৩ অর্থবছরে ছিল ৩০০ কোটি টাকা। এ হিসাবে আলাচ্য সময়ে প্রতি বছরেও কৃষিতে ভর্তুকি দ্বিগুণ হারে বেড়েছে। কিন্তু এই ভর্তুকির চিত্র সব কথা বলে না। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সমন্বিত সমর্থন (এএমএস) সংজ্ঞা অনুসারে বাংলাদেশ মোট কৃষি উৎপাদনের ১%-এরও কম ভর্তুকি দেয়। সর্বশেষ ২০০১-০২ অর্থবছরের হিসাব অনুসারে কৃষিতে বাংলাদেশের সমন্বিত ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ২৮৭.৮৩ কোটি টাকা। ঐ অর্থবছরে মোট কৃষিজ উৎপাদনের বাজার মূল্য ছিল ৪২ হাজার ২০৯.৫ কোটি টাকা। ফলে ভর্তুকির হার ০.৬৭%। গবেষণা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন অন্বেষণ সাম্প্রতিক এক গবেষণাপত্রে এ তথ্য প্রকাশ করেছে। উন্নয়ন অন্বেষণের তথ্য থেকে আরো জানা যায় যে, ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ভর্তুকির হার ছিল ১.০৩%। ১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরের এই হার ছিল ১.৫৪% ও ১.৫৮%। অথচ একই সময় ভারতের ভর্তুকির পরিমাণ দেখলে বিস্মিত হতে হয় বৈকি। ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে ভারতের কৃষি ভর্তুকির হার ছিল ৪.২% যা ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে বেড়ে হয় ৭.৭%। আর ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে এটি হয়েছে ৮.৫%।

**ক্রোড়পত্রটি সাপ্তাহিক ২০০০ এবং এ্যাকশনএইড বাংলাদেশের একটি যৌথ উদ্যোগ**